আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আল-ফিকহুল আকবারের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪. ৪. ২. ৩. দু‘আ, ডাকা বা প্রার্থনা

দু‘আ (دعاء) অর্থ আহবান, ডাকা, প্রার্থনা (call, pray, invoke)। ডাকা এবং প্রার্থনা করা পরস্পর জড়িত। কারো কাছে প্রার্থনা করতে হলে তাকে ডাকা হয় এবং সাধারণত কারো ডাকার উদ্দেশ্য তার সাহায্য প্রার্থনা করা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দু‘আকে অনেক সময় ‘ইসতি‘আনাহ (الاستعانة) অর্থাৎ ‘আওন’ বা সাহায্য প্রার্থনা, ‘ইসতিম্দাদ’ (الاستمداد), অর্থাৎ ‘মদদ’ বা সাহায্য প্রার্থনা, ‘ইসতিগাসাহ’ (الاستغاثة) অর্থাৎ ‘গাউস’ বা ত্রাণ প্রার্থনা বলা হয়। সবকিছুরই মূল ‘দু‘আ’ বা প্রার্থনা। প্রার্থনা বা ডাকার বিষয়বস্তু দু প্রকারের হতে পারে: লৌকিক ও অলৌকিক।

লৌকিক বা জাগতিক প্রার্থনা মানুষ স্বাভাবিকভাবে একে অপরের কাছে করতে পারে। এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেকজনের নিকট চেয়ে থাকে এবং মানুষ জাগতিকভাবে তা প্রদান করতে পারে। যেমন, কারো কাছে টাকাপয়সা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য ডাকা, সাহায্য চাওয়া, মাথার বোঝা পড়ে গেলে উঠাতে সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি। জাতি, ধর্ম, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা বা ডাকা অলৌকিক। জাগতিক উপকরণ ছাড়া অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি প্রার্থনা করা। এ জাতীয় প্রার্থনা শুধু কোনো ‘‘ধর্মের অনুসারী’’ বা ‘‘বিশ্বাসী’’ করেন। ‘‘বিশ্বাসী’’ কেবল ‘আল্লাহ’, ‘ঈশ্বর’ বা সর্বশক্তিমান বলে যাকে বিশ্বাস করেন, অথবা যার সাথে ‘ইশ্বরের’ বিশেষ সম্পর্ক ও যার মধ্যে ‘ঐশ্বরিক’ ক্ষমতা আছে, তার কাছেই এরূপ প্রার্থনা করেন বা তাকেই এভাবে ডাকেন।

দ্বিতীয় প্রকারের এ প্রার্থনাই ইবাদত-এর সর্বজনীন প্রকাশ। সকল যুগে সকল ধর্মের মানুষই মূলত তার আরাধ্য বা উপাস্যকে ডাকে ও তার কাছে প্রার্থনা করে অলৌকিক সাহায্য লাভের জন্য। উৎসর্গ, কুরবানি (sacrifice), মানত, ফুল, সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই দু‘আর জন্যই। যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্তু এ সকল উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদত ও কর্ম। এভাবে আমরা দেখছি যে দু‘আই ইবাদত-এর সর্বজনীন ও সর্বপ্রধান প্রকাশ। নু’মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী (ﷺ) বলেন :

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ .... وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

‘‘দু‘আ অর্থাৎ ডাকা বা প্রার্থনা করাই ইবাদত।’’ একথা বলে তিনি পাঠ করলেন[1]: ‘‘তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে (আমার কাছে

প্রার্থনা না করে) তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’’[2]

বিশ্বের সকল মুশরিকের ন্যায় আরবের মুশরিকগণের মূল শিরক ছিল অলৌকিক বা গাইবী সাহায্যের জন্য গাইরুল্লাহকে ডাকা। তারা বিপদে আপদে ফিরিশতা, জিন, ঈসা (আঃ), উযাইর (আঃ), ইবরাহীম (আঃ) ইয়াগূস, ওয়াদ্দ প্রমুখ নবী, ওলী এবং তাদের কল্পিত উপাস্যদেরকে ডাকত। এরূপ প্রার্থনার অসারতা প্রকাশ করে আল্লাহ বলেন:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

‘‘বল, ‘তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ধারণা কর তাদেরকে আহবান কর, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।’ তারা যাদেরকে আহবান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য সন্ধান করে, কে কত বেশি নিকটতর হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।’’[3]

মুশরিকগণ বিশ্বাস করত যে, ফিরিশতাগণ, জিন্নগণ, ঈসা (আঃ), উযাইর (আঃ), ইয়াগূস, ইয়াউক ও তাদের অন্যান্য জীবিত বা মৃত উপাস্যগণকে দুনিয়ার যেখান থেকেই ডাকা হোক তারা সকল গাইবী ডাক শুনেন ও সাড়া দেন। ফিরিশতাগণ, জিন্নগণ তো জীবিত, তাঁরা তো শুনেনই, উপরন্তু মৃত নবী-ওলীগণের আত্মা তাদের ডাক শুনেন ও সাড়া দেন। কুরআনের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, জিন্ন শয়তানগণ এ সকল মাবুদের রূপ ধরে তাদেরকে প্রতারণা করত; ফলে কাফিরদের এরূপ ধারণা জোরদার হতো।[4] মহান আল্লাহ এ বিশ্বাস খন্ডন করে জানান যে, এদের কেউই গাইবী ডাক বা দূরের ডাক শুনেন না এবং সাড়াও দেন না। উপরন্তু কিয়ামতের দিন এরা এ সকল পূজারীর বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবেন। আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

‘‘সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং তারা তার প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে তাদের শত্রু এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।’’[5]

যেহেতু দু‘আই ইবাদতের মূল প্রকাশ এবং এতেই বেশি শিরকে লিপ্ত হয় মানুষ, সেহেতু কুরআনে এ ইবাদতের কথা সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে বা একমাত্র তাঁরই কাছে দু‘আ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করার অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কোথাও মুশরিকরা যে তাদের উপাস্যদের ডাকত বা তাদের কাছে দুআ করার মাধ্যমে শিরক করত তা বলা হয়েছে। কুরআনে দু-শতাধিক স্থানে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে।

দু'আর শিরকের বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন: "মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট হাজত বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত। অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা, দরিদ্র ব্যক্তির সচ্ছলতা ইত্যাদি প্রয়োজনে তারা তাদের নিকট প্রার্থনা করত। এ সকল উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য তারা তাদের নামে মানত করত। তারা আশা করত যে, এ সকল মানতের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বিপদাপদ কেটে যাবে। তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এ সকল উপাস্যের নাম পাঠ করত। একারণে আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা সালাতের মধ্যে বলবে[6]:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[7]

একটি উদাহরণ থেকে আমরা লৌকিক এবং শিরকী ত্রাণ প্রার্থনা বা ডাকার মধ্যে পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করি। মনে করুন আমার গরুটি পালিয়ে যাচ্ছে, আমি পানিতে ডুবে যাচ্ছি বা পথ হারিয়েছি। আমি সামনে কোনো মানুষ দেখে বা কোনো মানুষ- জিন বা ফিরিশতা- থাকতে পারে মনে করে চিৎকার করে বললাম, ভাই, কে আছেন ভাই, আমার গরুটি ধরে দিন! আমাকে টেনে তুলুন! আমাকে পথটি বলে দিন!

এখানে আমি লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি দৃশ্য বা অদৃশ্য ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা ঐশ্বরিক গুণ কল্পনা করছি না। ঐ ব্যক্তির পরিচয়ও আমার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। আমি জানি যে, স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ একটি গরু ধরতে পারে, ডুবন্ত মানুষকে টেনে তুলতে পারে বা উক্ত স্থানের একজন বাসিন্দা পথটি চিনবে বলে আশা করা যায়। এজন্য আমি তার থেকে এরূপ লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি।

কিন্তু এ প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে যদি কেউ অনুপস্থিত কাউকে ডাকেন বা অনুপস্থিত কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে তা শিরক। কারণ সে মনে করছে, অনুপস্থিত অমুক ব্যক্তি সর্বত্র বিরাজমান বা সর্বদা সকল স্থানের সবকিছু তার গোচরিভূত। কাজেই, তিনি দূরবর্তী স্থান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন বা আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন এবং দূর থেকে আমার বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার মতো "অলৌকিক" ক্ষমতা তার আছে। এভাবে সে একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে অলৌকিকত্ব বা আল্লাহর বিশেষণ আরোপ করে শিরকে নিপতিত হয়েছে।

এছাড়া সে আল্লাহর ক্ষমতাকে ছোট বলে মনে করেছে। সে ঐ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা কল্পনা করেছে তা একান্তভাবেই আল্লাহর। কিন্তু সে তা শুধু আল্লাহর বলে মনে করে না। সে বিশ্বাস করে যে, এ ক্ষমতা যেমন আল্লাহর আছে, তেমনি অমুক ব্যক্তিরও আছে। বাহ্যত সে তার কল্পনার মানুষটির ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতার চেয়ে অধিক বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই সে আল্লাহকে না ডেকে তাকে ডেকেছে।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ জাতীয় কিছু শিরকী কর্মের বিষয়ে প্রসিদ্ধ তাফসীর-গ্রন্থ 'রূহুল মা'আনী'র প্রণেতা আল্লামা শিহাব উদ্দীন মাহমূদ আল আলূসী হানাফী (১২৭০ হি) তাঁর তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। মহান আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বলেছেন যে, মুশরিকগণ সাধারণ বিপদ-আপদে তাদের মাবুদদের ডাকত এবং কঠিন বিপদে আল্লাহকে ডাকত। এ প্রসঙ্গে সূরা ইউনুসের ২২ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা আলূসী বলেন: "এ আয়াত প্রমাণ করে যে, এরূপ অবস্থায় মুশরিকগণ মহান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকত না। আর আপনি ভালই

অবগত আছেন যে, আজকাল মানুষেরা কি করে! জলে বা স্থলে যখন কোনো কঠিন বিপদ বা বড় কোনো সমস্যার মধ্যে তারা নিপতিত হয় তখন তারা এমন ব্যক্তিদেরকে ডাকে যারা কোনো ক্ষতি করেন না এবং উপকারও করেন না, যারা দেখেনও না এবং শুনেনও না। তাদের কেউ খিযির এবং ইলিয়াসকে ডাকে। আর কেউ আবুল খামীস এবং আব্বাস (আঃ)-কে ডাকে। কেউ বা কোনো একজন ইমামকে ডাকে। কেউ বা উম্মাতের বুজুর্গ-মাশাইখের মধ্য থেকে কারো কাছে আকুতি আবেদন পেশ করে। তাদের মধ্যে একজনকেও দেখবেন না যে শুধু তার মালিক-মাওলাকে ডাকছে এবং শুধু তাঁর কাছেই আকুতি-আবেদন পেশ করছে। সম্ভবত তার মনের কোণে একবারও এ চিন্তা উকি দেয় না যে, যদি সে একমাত্র আল্লাহকে ডাকত তবে এ সকল বিপদ থেকে রক্ষা পেত। হে পাঠক, আল্লাহর কসম দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো, এ দিক থেকে মক্কার মুশরিকগণ এবং বর্তমানের মানুষদের মধ্যে কোন দল অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত? উভয় প্রার্থনাকারী ও আহবানকারীর মধ্যে কার প্রার্থনা অধিকতর সত্য?’’[৪]

এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী বলেন: ‘‘কবর পূজারীগণ যে সমস্ত কারণে কবর পূজা করিয়া থাকে উহাদের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হইল নিজেদের কুকর্মের সমর্থনে মিথ্যা হাদীস সৃষ্টি করা। নিজেদের মনগড়া এই জাতীয় হাদীস প্রচার করিয়া সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে ধোঁকা দিয়া আল্লাহর পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। ..... কবর পূজারী সম্প্রদায় তাহাদের কুকর্মের সমর্থনে যে সমস্ত অলীক ও মনগড়া কাহিনীর অবতারণা করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে উহা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। যেমন তাহারা বলিয়া থাকে যে, অমুক ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়িয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। মুক্তির কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অমুক দরবেশের মাজারে গিয়া বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়। কি আশ্চর্য! সেই দরবেশ তাহাকে দুই-একদিনের মধ্যে সমস্ত বিপদাপদ দূর করিয়া দেয়। ... এমনকি কেহ কেহ নিজের কথাও বলিয়া থাকে যে, আমি অমুক বিপদে পতিত হইয়া শেষ চেষ্টা স্বরূপ অমুক পীরের মাজারে নযর-নেওয়াজ লইয়া গিয়া তাহার সকল বিপদ দূর করিয়া দেয় .....

নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের সকলকে এই শিরক ও বিদআত হইতে নিরাপদ রাখুন।... ঘর হইতে পা বাড়াইলেই যে আল্লাহর খালেছ ইবাদতখানা মসজিদ সেখানে যাওয়ার কষ্টটুকু ইহারা স্বীকার করিতে চায় না। অথচ মাইলের পর মাইল, দিনের পর দিন হাঁটিয়া গিয়া কবরের নিকট ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকাকেই শ্রেয় মনে করে।... ইহারা যদি কবরে না গিয়া রাস্তাঘাট, হাট-বাজার অথবা গোসলখানায় বসিয়াও এমন কাকুতি-মিনতি ও একাগ্রতার সাথে কান্নাকাটি করিয়া মুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিত তবুও আল্লাহ তাদের দোআ কবুল করিতেন, তাহাদের দোআ ব্যর্থ হইত না। সুতরাং এই অবস্থায় কবরের বুযুর্গী ও প্রভাব মনে করা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ব্যতীত কিছুই নহে। আল্লাহ বিপদাপন্নের দোআ যে সকল সময়ই কবুল করিয়া থাকেন ইহা এই অজ্ঞেরা বুঝিতে চায় না। এমন কি কাফেরও যদি আল্লাহর নিকট একাগ্রতার সাথে দোআ করে আল্লাহ তাহাও কবুল করিয়া থাকেন।... ।’’[৭]

বাংলার প্রসিদ্ধ পীর ও সংস্কারক ফুরফুরার পীর শাইখ আবূ বকর সিদ্দীকী (১৩৫৮হি/১৯৩৯খৃ)-এর নির্দেশে আল্লামা রুহুল আমিন (১৩৬৪হি/১৯৪৫খৃ) দুআ, ডাকা বা প্রার্থনা বিষয়ক শিরকগুলো ব্যাখ্যা করেন। তিনি হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন শিহাবুদ্দীন ইবনুল বায্যায রচিত ফাতাওয়া বায্যাযিয়্যাহ, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবীর আল-কাওলুল জামীল, শাহ আব্দুল আযীয দেহলবীর তাফসীরে আযীযী, শাহ রফীউদ্দীন দেহলবীর রেসালায়ে নুযূর, শাহ ইসহাক দেহলবীর মিআত মাসাইল, কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর এরশাদুত্তালিবীন, মাওলানা আব্দুল হাই

লাখনবীর মাজমুআ ফাতাওয়া ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত নিম্নরূপ শিরকগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন:

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে গাইবী ইলম বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, মনোবাঞ্ছা পূরণকারী বা কল্যাণ-অকল্যাণে সক্ষম বলে ধারণা করা শিরক। বিপদে আপদে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিপদ মোচনের জন্য ডাকা বা কারো দিকে মনোনিবেশ করা শিরক। (ইয়া শাইখ আব্দুল কাদির, শাইয়ান লিল্লাহ): হে শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী, আল্লাহর জন্য আমাকে কিছু দিন, অথবা হে খাজা শামসুদ্দীন পানিপতি, আল্লাহর জন্য আমাকে কিছু দিন.. ইত্যাদি বলা শিরক।

মহান আল্লাহ তাঁর ওলীদেরকে বিশ্বের সকল স্থানের মানুষদের ডাক শোনা, অবস্থা জানা বা সাহায্য করার অলৌকিক জ্ঞান বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে বিশ্বাস করা শিরক।
যদি সালাত-সালাম বলার জন্য কেউ দূর থেকে ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ’ বলে তবে তা বৈধ। আর যদি কেউ ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ বা কোনো ওলী দূর থেকে ডাকলে শুনতে পান, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখেন, দুনিয়ার কার্য নির্বাহ করেন অথবা বিশ্ব পরিচালনায় কোনোভাবে আল্লাহর কাজের অংশীদার আছেন বা এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তিতে দূর থেকে ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া ওলিয়াল্লাহ ইত্যাদি বলে ডাকে তবে তা সুস্পষ্ট শিরক। এরূপ শিরক বাতিল করতেই নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন।
নবীগণ বা ওলীগণ সব সময় হাযির-নাযির, বা দূরের ডাক শুনেন ও দুআ করেন বলে ধারণা করা হারাম ও সুস্পষ্ট শিরক।
পীরগণের রূহ হাযির বা লোকদের অবস্থা জানেন বলে বিশ্বাস করা শিরক।

কেউ যে কোনো স্থান থেকে ডাকলে ‘গাওস আযম’ তা শুনতে পারেন বা তার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেন বলে আকীদা পোষণ করা শিরক।[10]

ফুটনোট

[1] সূরা গাফির (মুমিন) : ৬০ আয়াত।

[2] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২১১ (কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাব ওয়ামিন সূরাতিল বাকারাহ) ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/১৭২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৬৭। হাদীসটি সহীহ।

[3] সূরা (১৭) ইসরা/ বানী ইসরাঈল: ৫৬-৫৭ আয়াত। তাবারী, ইবনু কাসীর ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীর দেখুন।

[4] দেখুন: সূরা (৩৪) সাবা: ৪০-৪১; (১৬) নাহল: ৮৬-৮৭ আয়াত।

[5] সূরা (৪৬) আহকাফ: ৫-৬ আয়াত।

[6] সূরা (১) ফাতিহা: ৪ আয়াত।

[7] শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১/১২৯।

[8] আলূসী, রুহূল মাআনী ৭/৪৭৪।

[9] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. ৪৪-৪৭।

[10] মোহাম্মদ রুহুল আমিন, বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন, পৃ. ১-১৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7124

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন